ATMADEEP
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-I, September, 2024, Page No. 26-32
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.01W.004

শোষণে এবং বৈষম্যে চা-বাগানের নারী: নির্বাচিত গল্পের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা

আজিজুল সেখ, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরা, ভারত*
E mail: azizul.bengali@tripurauniv.ac.in

Received: 25.08.2024; Accepted: 27.09.2024; Available online: 30.09.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

ABSTRACT

Even in the twenty-first century, women are still victims of discrimination, neglect, and disregard in a patriarchal society. While women in mainstream society strive to find their identity and place, the overall condition of women in marginalized tea gardens becomes unimaginably dire. In an era of artificial intelligence, where people are enjoying the benefits of modernity through science and technology, the inhabitants of the tea gardens in the Duars region of North Bengal remain backward in all socio-economic, political, and cultural aspects. Storytellers from North Bengal have attentively portrayed the intense suffering of tea garden women in their narratives. This essay aims to objectively highlight that aspect.

***Keyword**: North Bengal, Duars, Tea Garden, Women, Twenty-first century, Bengali short stories, Marginalized life*

একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে এসেও সামাজিক বৈষম্যের নগ্নত্ব আরও প্রকট। তথাকথিত অতি-আধুনিকতার যুগে পৌঁছে গেলেও, সময় ও সমাজ আজও নারীকে অবজেক্ট করেই রাখলো। গুটিকয়েক উদাহরণ হয়ত ঠুলি পড়ানোর চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু তাতে জনসমুদ্রের মতো নারী বৈষম্য, নারী অত্যাচার, নারী শোষণ-উৎপীড়নের দিকটি বিন্দুমাত্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয়না। সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, ইত্যাদি সমস্ত রকম ভাগ-বাঁটোয়ারায় শোষণের, ব্যবহারের কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে থাকে নারী। শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার ভীষণ চেষ্টায় নারী মুক্তির উচ্চকণ্ঠের গান শোনানোর আয়োজন হলেও, মোবাইল, জামা-কাপড়, গাড়ি, বাড়ি, টিভি, ফ্রিজ - ছোট থেকে বড়, প্রায় সমস্ত বিষয় বস্তুর বিজ্ঞাপনের কর্মকাণ্ডে নারীকেই ব্যবহার করা হয়, বস্তুর মতো করে। চা-বাগান এবং সেখানকার নারীর অবস্থান নিয়ে আলোচনা প্রশঙ্গে এই বিষয় গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবেই উপস্থাপনের দাবী রাখে। কারণ সমাজভেদে, ভৌগোলিক অবস্থান ভেদে, নারীর জীবনের অবস্থায় পরিবর্তন এলেও মূলগত বৈশিষ্ট্যতে কোনরকম পরবর্তন নেই। সমাজের উচ্চ শ্রেণির নারী থেকে শুরু করে প্রান্তিক নারী মানুষদের জীবনের মূলসুরটি একই সুতোয় গাঁথা।

উত্তরবঙ্গের তরাই-ডুয়ার্স সবুজপাতার দেশ। তরাই-ডুয়ার্স অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে সমগ্র আলিপুরদুয়ার জেলা, জলপাইগুড়ি জেলার অনেকাংশ এবং কোচবিহার ও দার্জিলিং জেলার কিছু অংশ। এই পার্বত্য ও তরাই-ডুয়ার্স অঞ্চলের চা-বাগান, চা বাগানের সাথে জুড়ে থাকা মানুষের ইতিহাসের পথচলা শুরু হয় ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে গাজোলডোবায় চা-বাগিচার পত্তনের মধ্য দিয়ে। উত্তরবঙ্গের আদিবাসীরা একাজে প্রথমে যুক্ত হননি। ফলে পাহাড় থেকে এবং দেশের অন্যান্য ভাগ থেকে পরিযায়ী হিসেবে শ্রমিকরা এখানে যোগদান করে। ইংরেজ শাসনকাল শুরু হবার আগে থেকেই এই ডুয়ার্স অঞ্চলে বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষ ও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করতেন। যেমন টোটো, মেচ, রাভা, গারো, ভুটিয়া, রাজবংশী ইত্যাদি। চা চাষ শুরু হবার পর অন্যান্য অঞ্চল যেমন ছোটোনাগপুরের মালভূমি অঞ্চল, বিহার ইত্যাদি জায়গা থেকে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষ চা শ্রমিক হিসেবে এখানে আসে। এই চা শিল্প, চা বাগান, চা শ্রমিকদের বাদ দিয়ে উত্তরবঙ্গের জীবন ও সংস্কৃতি অপূর্ণ। কারণ চা বাগানের নিজস্ব অর্থনীতি, নিজস্ব সংস্কৃতি ও সংগ্রামের ইতিহাস রয়েছে। আমরা ইতিহাসে থেকে জানতে পারি যে চা-সংস্কৃতি ইংরেজরা প্রচলন করেছিল। এই সূত্র ধরে এগোলে দেখা যায় চা-শিল্পের ইতিহাসের রূপরেখা এবং এর সাথে বিশ্বায়নের যোগাযোগ। এসব চা-বাগানের সাথে জড়িত চা শ্রমিকদের জীবন-সংকট, সংস্কৃতি এবং মালিকপক্ষও ছোটগল্পের আধার হিসেবে উঠে আসে। উত্তরবঙ্গের উল্লেখযোগ্য গল্পকাররা প্রায় সবাই চা-বাগান এবং সেখানকার মানুষকে বিষয় করে গল্প লিখেছেন। আমি আমার স্বল্প পরিসরের আলোচনায় গল্পকার সুচন্দ্রা ভট্টাচার্য, শুক্লা রায় এবং মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য'র লেখা গল্পকেই মূল আধার করেছি।

চা-বাগানের মালিকরা, ম্যানেজার, দালালরা সেখানকার গরীব আদিবাসী নারীদের নিজেদের সম্পত্তি মনে করে। তাদের এই মনে করাটা, সমাজের অন্যান্য বর্গের থেকে খুব একটা আলাদা নয়। সমাজের প্রায় সমস্ত অংশেই এই ক্যান্সার লুকিয়ে রয়েছে। স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত, বিশ্ববিদ্যালয়, কাজের জায়গা, প্রায় প্রতিটি অংশেই নারীকে তার শরীর দিয়ে বিচার বিবেচনা করে তথাকথিত পুরুষ সমাজ। ভোগ্যপণ্য হিসেবে বিবেচনা করার এই প্রয়াস চা-বাগানের নারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়। গল্পকার **সুচন্দ্রা ভট্টাচার্য** তাঁর **'উজান পাঠ'** গল্পে, মুন্নি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে সেই বিষয়টিই তুলে ধরেছেন। গল্পকারের জন্ম **১৯৭৪** সালে পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তীয় জেলা কোচবিহারে। ফলত ডুয়ার্সের সাথে তাঁর যোগাযোগ অনিবার্যই ছিল। মানুষ আর প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে ভালোবাসা, অনেক সম্পর্কের টানাপোড়েন, যন্ত্রণা আর উপলব্ধি থেকে তুলে আনেন তাঁর গল্পের রসদ। অফুরান জীবনের হালহদিশ উঠে আসে তাঁর

গল্পে। আদিবাসী সমাজ, সেখানকার জীবন জীবিকাও তাঁর মরমি মননের ফসল হিসেবে গল্পাকারে পেশ করেন পাঠকের দরবারে।

চা-বাগানের নারীর মনেও উদাস করা বসন্ত আসে। রক্তিম পলাশের মতো এলোমেলো করা রঙে রাঙিয়ে দিয়ে যায় প্রেম। যৌবনের স্বাভাবিক নিয়মকে পাশ না কাটাতে পারা মুন্নি বাবার অমতে চা-ফ্যাক্টরির মিস্তিরি বাবলুকে বিয়ে করে। বাগানের নারী এবং পুরুষের মধ্যেকার সম্পর্ক অনেকটাই শরীর কেন্দ্রিক। তাদের ভালোথাকা, সম্পর্কে থাকা অথবা সম্পর্ক থেকে বেড়িয়ে যাওয়াতেও এই শরীরই মূখ্য ভূমিকা পালন করে। যদি সে পুরুষের চাওয়ার মধ্যে মিথ্যে জড়িয়ে থাকে, তাহলে তা আগুনে ঘি'র মতো কাজ করে। বাবলু মুন্নির ক্ষেত্রেও এই ঘটনাটিই ঘটে। নারীকে শুধুই শরীর হিসেবে দেখা বাবলু বছর যেতে না যেতেই মুন্নির শরীরে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। নির্দ্বিধায় গর্ভবতী মুন্নিকে ফেলে পালিয়ে যায়। কিন্তু "মুন্নির মতো ডাঁশা মেয়েকে ভাতার ছেড়ে গিয়েছে"[১], এই খবর বাগানের পাকা দালাল রামু সোরেনের কাছে যেন জ্যাকপট। কারণ খুব সহজেই মুন্নিকে মালিক, ম্যানেজারদের ফুর্তির অংশ করতে পারবে এবং তাতে তার আর্থিক লাভের সম্ভাবনা প্রচুর। গল্পকার একটি নারী চরিত্রের আড়ালে এখানে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নগ্নতাকে উন্মোচন করেছেন এই তিন প্রকার পুরুষের মাধ্যমে।

ক. বাবলু : যে কী না এক মিথ্যে পুরুষ। মুন্নিকে মন থেকে ভালোবাসেনি। মুন্নিকে বিয়ে করেছে শুধুমাত্র তার শরীরের জন্যই। যা স্পষ্ট। তাই যখন মুন্নির শরীরকে তার জানা হয়ে গেল, মুন্নি গর্ভবতী হয়ে পড়লো, তখন সে তাকে রেখে পালালো। এই পালিয়ে যাওয়া কোন সমাপ্তির কথা বলে না, আরও অন্য কোন নামের, অন্য কোন নারী শরীরের খোঁজে বাবলুর নতুন শুরুও হতে পারে। আর সেটা হওয়াই স্বাভাবিক। ভালোবেসে নারী যে পুরুষের কাছে যায়, সেখানেও সে এভাবেই সহজে প্রতারিত হয়ে যায়। চা বাগানের মুন্নির সাথে সমাজের বাকী অংশের নারী যেমন মিলে যায়। ঠিক তেমনিভাবে বাবলু নামের চরিত্র গুলোও আমাদের সামনে ভেসে আসে।

খ. রামু সোরেন : মানবিক মূল্যবোধহীন এক মেরুদণ্ডহীন লোভী পুরুষ। দালালি করে জীবন কাটানো রামুদের মতো ধূর্ত লোকেরা আমাদের আশেপাশে যথেষ্ট পরিমাণেই দেখা যায়। যারা নারীদের দূর্বলতার সুযোগে তাদের ব্যাবহার করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না। নিজের ঘরের মেয়ে, স্ত্রী, মা'র কথাও তাদের মনে আসেনা। তারা জীবন ধারণের জন্য ইচ্ছেমত নীচে নেমে যেতে পারে। তাই যখন জানতে পারে মুন্নির স্বামী তাকে ফেলে পালিয়েছে, তখন লোভী রামুর চকচকে চোখে কুমিরের অশ্রুপাত দেখা যায়। মুন্নির সামনে পথ থাকে না। কারণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পুরুষের পরিচয়েই নারী অবস্থান করে। তাই পুরুষ সরে যেতেই যেন নারীর মাথার উপরের ছাদ ও সরে যায়। আর সেই সুযোগের অপেক্ষাতেই থাকে রামু সোরেনের মতো মানুষেরা। রামু ফাঁদ পাতে, "ম্যানেজার সাহেবের বাংলায় কাম দুব, হাত ভরে পয়সা লিয়ে রাণী বনে যাবি"[২]। সে ফাঁদে পা না ফেলা ছাড়া মুন্নির মতো চা-বাগানের নারীদের আর কোন পথ থাকে না।

গ. ম্যানেজার-মালিক : কামুক সর্বস্ব, শরীর লোভী মানুষরূপী শেয়াল-শকুন মনস্ক পুরুষ। এরা আর্থিকভাবে এতটাই শক্তিশালী যে তার প্রভাব খাটিয়ে জঘন্যতম কাজগুলোও নির্দ্বিধায় করতে পারে। নারী শোষণের ক্ষেত্রে, এদের কাছে জাত-পাত, বর্ণ-গোত্র, কোন কিছুই কোন বিষয়

হয়ে দাঁড়ায় না। এই ম্যানেজার-মালিকদের মতো মানুষ ভিন্ন নামে ভিন্ন পরিচয়ে এই সমাজের চারদিকে নারীদের ব্যবহার করে যায়।

গল্পকার মুন্নি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে চা-বাগানের প্রায় প্রতিটি নারী চরিত্রের শোষণের ছবিকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। কচি দেবদারুর মতো কোমল উজ্জ্বলতায় ঘিরে থাকা মুন্নির চেহারায়, মুখশ্রীতে - সময়ের সাথে সাথে জায়গা করে নেয় কাজল, রঙিন ঠোঁট, সাবান ঘষা রুক্ষ চুল, অশ্লীল ভঙ্গিতে পড়া শাড়ি। আসলে এসবের মধ্যে দিয়ে গল্পকার ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন চা-বাগানের নারীদের অসহায় অবস্থান। আর তাতে তিনি সফল।

সমাজের বিভিন্ন অংশে নারীর সাথে যে বৈষম্য ঘটে থাকে, তা সব সময় পুরুষতান্ত্রিক, এমনটাও নয়। আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া সমাজের নারীদের জীবন জুড়ে যে সংগ্রাম থাকে তা সেই সমাজের সাথে নিবিড়ভাবে জুড়ে না থাকলে অনুভব করা সম্ভব নয়। গল্পকার **শুক্লা রায়ের (১৯৭৭)** জন্ম ফালাকাটার খগেনহাটে। ফলত চা-বাগান এবং সেখানকার মানুষদের সাথে তাঁর যাপন করা মূহুর্তগুলোর নিখাদ বাস্তব প্রতিফলন তাঁর **'বারবাঁক'** গল্পটিতে দেখতে পাওয়া যায়। যে গল্পে চা-বাগানের দুজন নারীর সমান্তরালে চলতে থাকা জীবনের ছবি উঠে এসেছে।

গল্পকথক এবং রান্থি একই ক্লাসে পড়ে। কথককে বারবাঁকের জল দেখতে চাওয়ার জন্য বাবার অনুমতি নিতে হয়। কারণ তাদের বেড়ে ওঠায় সেই সংস্কারই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার সহপাঠী রান্থির বাবা, যে কী না বাগানে কাজ করতো, অতিরিক্ত নেশা করার কারণে বড়ো ড্রেনে ঘাঁড় গুঁজে মারা যায় অনেক আগেই। তাই একই চা-বাগানের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও রান্থি এবং কথকের জীবনের মধ্যে ন্যূনতম মিলও খুঁজে পাওয়া যায় না। রান্থির মা কষ্ট করে তাদের সংসার চালায়। আর্থিক দিক দিয়ে যে পরিবার ভীষণ ভাবে পিছিয়ে, তাদের কষ্টের শেষ থাকে না। অন্তহীন সেই কষ্টের যাত্রা যেন অসীম। ফলস্বরূপ খাবার, পোশাক, ওষুধ, ভালোভাবে বেঁচে থাকার ন্যূনতম সুযোগটুকুও তাদের থাকে না। এক অসহায় অবস্থা চা-বাগানের মানুষদের নিত্য সঙ্গী। রান্থি, রান্থির মা, তার বাবা, যেন সেই চরমতম দুঃখের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শিক্ষা আনে চেতনা, আনে আর্থিক স্বচ্ছলতা, আনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আনে মুক্তি। কিন্তু তাতেও বাধা। তাই পড়তে চাওয়া রান্থি যখন বেশ কিছুদিন স্কুল কামাই করে, এবং শেষে দেখতে পাওয়া যায়, হাটখোলায় হাড়িয়া নিয়ে বসেছে বিক্রির জন্য, সেদিন বোঝা যায় রান্থিদের চেষ্টায় শেষ পেরেকটাও গাঁথা হয়ে গিয়েছে। জানা যায় তার মা মারা গেছে। ফলে এই বয়সেই তাকে হাড়িয়া নিয়ে হাটে আসতে হয়েছে, কারণ তার ভাই, বোন রয়েছে। গল্পকার কথকের জায়গায় যেন নিজেকেই রেখেছেন, কিন্তু তাঁর এই উচ্চারণ গুলোতে কোনরকম বৈষম্য দেখা যায়নি, দেখা গিয়েছে জীবনে। যা আমাদের বিস্মিত করে।

ক. জীবন : একই বয়সের দুটি মেয়ের জীবন দুই খাতে বয়ে যাওয়া নদীর মতো। একজন বাবার ছায়ায় ঘিরে বেড়ে ওঠে অন্যদিকে আরেকজন বাবা, মা-হীন জীবন কাটায়। কথক সাইকেলে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু রান্থিকে এই বয়সেই ভাই, বোনের দায়িত্ব নিতে হয়। তাকে হাড়িয়া বিক্রি করতে হয়।

খ. আর্থিক স্বচ্ছলতা অথবা টানাপোড়েন : যে বিষয়টি সমাজে বিভিন্ন ভাবে প্রমাণিত, তা হলো অর্থের স্বরূপ। সুখ বা স্বাচ্ছন্দ্যের বাইরে গিয়েও শিক্ষালাভের বিষয়টি জুড়েও থাকে অর্থ। আজ একুশ শতকে এসেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সরকারি বা বেসরকারি স্তরে বিভিন্ন সাহায্যের উপায় থাকা সত্ত্বেও, গরীব পিছিয়ে পড়া মানুষদের জীবনে পরিবর্তন আনার প্রথম ধাপ হিসেবে শিক্ষা লাভের জন্য অর্থের প্রয়োজন ভীষণ ভাবে। আজ যখন কথা ওঠে সংরক্ষণ বিষয়টি

ওঠানো উচিত কী না, তখন গল্পের রান্থিদের মতো যারা এই সমাজে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তাদের কথা মানবিকতার সাথেই ভাবা উচিৎ।

গ. সমান্তরালে যে শেষের শুরু থাকে : স্কুল জীবন পার করে কথক ধূপগুড়ি চলে যান, সেখানে উচ্চমাধ্যমিক, কলেজ পাশ করে ইউনিভার্সিটির পড়া শেষ করেন। জীবনের এতগুলো বছর শিক্ষা লাভে কাটিয়ে যখন বাড়ি ফেরেন তখন দেখা হয় রান্থির সাথে। মেলায় ঘুরতে যাওয়া কথকের সাথে এক আদিবাসী মহিলার দেখা হয়, যে কীনা রান্থি। আসলে আদিবাসী মহিলা শব্দ প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে গল্পকার এই দুই নারীর শারীরিক মানসিক পরিবর্তনের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বিপরীতে থাকা অভাব অনটন একজন মানুষকে যে কতটা পরিবর্তন করতে পারে তাই এই বক্তব্যটিতে স্পষ্ট। এই রান্থির রুগ্ন চেহারায় এক হেরে যাওয়া মানুষের প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট। যা কম বেশি চা-বাগানের প্রতিটি নারী পুরুষের মধ্যেই দেখা যায়। এই ক-বছরে রান্থির বিয়ে, স্বামীর মৃত্যু, বাচ্চা নিয়ে কষ্টের সংসার। সমান্তরালে দুটি নারীর জীবন, চা-বাগানের পটভূমিতে এভাবেই গল্পকার তুলে ধরেছেন।

গল্পে রান্থি কথককে দেখলে হাসতো কিন্তু হাঁটা থামাতো না। কারণ তাদের থামতে নেই। সামাজিক নিষ্ঠুরতার সবচেয়ে নানা রকমের চিত্র আমাদের সামনে ভেসে আসে। কিন্তু কিছু নিষ্ঠুরতা এমনও থাকে যা আমাদের অগোচরেই থেকে যায়। কখনো তা আমাদের সামনে ভেসে আসে দলছুটের মতো। চোখ ঝাপসা হয়ে আসার জন্য যা যথেষ্ট। তাই রান্থিদের দেশ যেন অন্য কোন দেশ, যা আমাদের পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। আমরা অনুভব করতে পারি, চোখ মেলে এপার থেকে দেখতেও পারি কিন্তু যেতে পারি না, ঠিক যেমন কথকও পারেননি।

যে গল্পকার মনে করেন প্রকৃত আধুনিকতা থাকে লেখকের চোখে, মনে, চেতনায়, হৃদয়েও; সেই সময় সচেতন লেখক **মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য (১৯৭০)** তাঁর **'সম্পর্কহীনা দূর'** গল্পটিতে, চা-বাগানের জীবনে সামনে রেখে তথাকথিত সুশীল সমাজের নগ্নতাকে প্রকটাকারে তুলে ধরেছেন অত্যন্ত সুচারুভাবে। চা-বাগানের মালিক, ম্যানেজার, সর্দার, দালালদের হাতে সেখানকার নারী সমাজ কীভাবে শোষিত হয় সেই চিত্রের পাশাপাশি গল্পকার তুলে ধরেছেন সমাজের কাগুজে অর্থহীন আলোচনা করা মেকি মানুষদের মনকেও।

নাগরাকাটার প্রত্যন্ত এক চা-বাগানের এক আদিবাসী নারী রোজি টোপ্পো। সে আর তার মরদ চা বাগানে পাতা তোলার কাজ করে। দুটো বাচ্চাও রয়েছে তাদের। এই ঢেউহীন অভাব অনটনের জীবন চলতে থাকলেও নারী শরীর লোভী লেবার লাইনের সর্দার এতোয়ার নজর পরে রোজীর দিকে। রোজীর আগে বাগানের অন্য কিছু মহিলাকে শারীরিক শোষণ করলেও রোজীকে এতোয়ার পক্ষে পাওয়া সম্ভব হচ্ছিলো না। কারণ রোজী ছিলো অন্য ধাঁচের মেয়ে। কিন্তু নারী শরীর লোভী মানুষরূপী এইসব জন্তুসুলভ পুরুষরা চা-বাগানের নারীদের ভোগ করার জন্য বিভিন্ন উপায় বের করে রেখেছে। গল্পের বাইরে গিয়েও এসব কখনো ফাঁক ফোঁকর দিয়ে বেরিয়ে এসে সংবাদে জায়গা করে নেয়। যদিও সেই নিতে পারাটা যৎসামান্য। কিন্তু বেরিয়ে আসে। কুপ্রস্তাবে রাজি না হওয়া চা-বাগানের নারীদের ডাইনি অপবাদ দিয়ে তাকে শারীরিক শোষণ করা হয় এবং মেরে ফেলাও হয়। গল্পের রোজীর ক্ষেত্রেও তেমন ই ঘটে। কিন্তু সে তার স্বামীর সাহায্যে পালিয়ে যায়। কিন্তু তার ছেলে, মেয়ে, স্বামীর কাছে কখনোই ফিরতে পারবে না। ফিরেত পারবে না তার ছোট্ট ঘরটিতে। শুধু প্রাণে বাঁচতে এক অজানা অচেনা নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়ায়।

রোজীর এই দুঃসময়কে সামনে রেখেই গল্পকার তথাকথিত বৌদ্ধিক, সুশীল সমাজের ফাঁপা অনুভবকে নগ্নভাবে তুলে ধরেছেন। গল্পকথক একজন কলেজ অধ্যাপক এবং নামী কবি। ঋষব ঘোষ

ইউনিভার্সিটির নামী প্রফেসর এবং তার স্ত্রী সন্দীপ্তা কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল। এরা শিলিগুড়ির এক অভিজাত হোটেলে আলোচনায় যোগ দেয়, যার বিষয় - সতীত্ব, পুরুষতন্ত্র, সমাজ। সেখানে বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদ, আমলা, অধ্যাপক, মনোবিদ, সাংবাদিকরা অংশগ্রহণ করে। আলোচনা করে ফেরার পথে কনকনে ঠান্ডায়, প্রচন্ড কুয়াশায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা অসহায় রোজী যখন সাহায্য প্রার্থনা করে, তখন এরা কেউই তাকে সাহায্য করেনি। নারীবিষয়ক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শুধু আলোচনাতেই থেকে যায়। এক নারী যে কী না শুধুমাত্র প্রাণে বাঁচতে চেয়ে ছেলে, মেয়ে, স্বামী ছেড়ে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছে, তাকে তারা সাহায্য করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেনি। অথচ এই ঘটনার পর, 'নারী' নামক এক প্রতিষ্ঠিত সংস্থার আলোচনা সভায় এরা আবার আলোচনায় বসেন, যার বিষয় 'নারীমুক্তি'।

মরমি মননের উৎকর্ষ এক ফসল এই গল্প। গল্পকার রোজীর মধ্যে দিয়ে চা-বাগানের নারী শোষণের পাশাপাশি, সমাজের উচ্চ স্তরের মেধাসম্পন্ন মানুষদের মানবিকতাহীন নগ্ন চেহারাকে তুলে ধরেছেন। আসলে প্রান্তিক এই চা বাগান গুলোর নারীরা প্রতিদিন প্রতিনিয়ত এক অসম সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যান। যা সমাজের উঁচু স্তরের মানুষরা আলোচনা করতে পারে, গল্পে, শিল্পে, সাহিত্যে, সংস্কৃতির বিভিন্ন ভাগে তুলে আনতে পারে, কিন্তু তাতে সবটুকু দিয়ে শরিক হতে পারে না।

প্রকৃতির অপরূপ দুটি সৃষ্টি হলো বিস্তৃত সবুজ চা-বাগান ও নারী। নারীর সাথে চা-বাগান তার অনন্য রূপ রস গন্ধ নিয়ে জড়িয়ে থাকে। চা-বাগান শুধু সৌন্দর্য বৃদ্ধিই করে এমন নয়, তাই আমরা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে চা-বাগানের নজরকাড়া সৌন্দর্যের বাইরে গিয়ে দেখতে পাই জীবন যুদ্ধের ভয়াবহতা। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ, তাতে ভুসুকুপাদ লিখেছেন, 'অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী' যা এই একুশ শতকে এসেও চূড়ান্তভাবে সত্য। পাশাপাশি সামাজিক, আর্থিক বৈষম্য। সব মিলিয়ে চা-বাগানের নারী এবং তাদের জীবন বিষাদমাখা কাব্যের মতো অন্তহীন অনুরনন তুলে যায় প্রতিনিয়ত। পশ্চিমবঙ্গের তরাই-ডুয়ার্স অঞ্চলের এই চা-বাগানের মতো উত্তর পূর্ব ভারতের আসাম, ত্রিপুরাতেও রয়েছে চা-বাগান। চা-বাগানের উদ্ভব এবং শুরুটাই হয়েছিল আসামে। ছোটগল্প প্লট ও চরিত্র নির্ভর। তাই খুব স্বাভাবিক কারণেই তরাই-ডুয়ার্স অঞ্চলের মতো আসাম বা ত্রিপুরা অঞ্চলের ছোটগল্পের মধ্যে সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায় - যেমন, সর্দারের হম্বিতম্বি, মালিকপক্ষের অসীম লোভ, চিমনির ধোঁয়া, কুলি কামিনদের প্রতি নির্লজ্জ শোষণ। কিন্তু এসবের বাইরে যে বিষয়টিতে সব থেকে বেশি মিল, তা হলো চা-বাগানের মহিলা শ্রমিকদের মালিকের নিজস্ব সম্পত্তি মনে করা। উত্তর-পূর্বের আসাম এবং ত্রিপুরার, উল্লেখযোগ্য গল্পকার, রণবীর পুরকায়স্থ, কাজল দেমতা, জয়া গোয়ালা, ঝুমুর পান্ডে, শর্মিলা দত্ত, প্রমুখ এই অঞ্চলের চা-বাগান, চা-শ্রমিক নিয়ে লিখেছেন।

আমরা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যের গল্পের সেই সুশীল সমাজের মতো হয়তো এড়িয়ে যাই, বা দেখতে চাই না বা শুনতেও চাই না, প্রান্তিক এইসব নারীদের শোষণ, নির্যাতন। কিন্তু সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে সামাজিক সাম্যাবস্থা বজায় রাখার জন্য আমাদের এইসব বিষয়ে অনুভবি হওয়া উচিৎ। আজ এই আলোচনা সভায় চা-বাগানের নারীদের নিয়ে যে আলোচনাটুকুর প্রয়াস করা গেল এই উপস্থাপনায়, তাতে যদি কয়েকজন মানুষের মধ্যেও চা-বাগানের নারীদের নিয়ে ভাবনার জায়গা তৈরী হয়, তাহলে সেটাই হবে এই প্রবন্ধ উপস্থাপনের, তথা এই কলেজের সেমিনারের সার্থকতা।

আকরগ্রন্থ :

১. ভট্টাচার্য মৃগাঙ্ক, ২০২০, *সম্পর্কহীনা দূর*, সঞ্জয় সাহা (সম্পা.), *চা-বাগানের গল্প*, হাওয়াকল প্রকাশন, কলকাতা
২. ভট্টাচার্য সুচন্দ্রা, ২০১৪, *উজান পাঠ*, *ষোল কন্যের গপ্পো*, অন্য কাগজ প্রকাশনী, জলপাইগুড়ি
৩. রায় শুক্লা, ২০২২, *বারবাঁক*, দেবায়ন চৌধুরী(সম্পা), *উত্তর উত্তর*, এখন ডুয়ার্স প্রকাশনা, জলপাইগুড়ি

তথ্যসূত্র :

১. ভট্টাচার্য সুচন্দ্রা: ২০১৪ : ৭৪
২. ভট্টাচার্য সুচন্দ্রা: ২০১৪ : ৭৪